প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের কৃষি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই শিল্পায়নের যুগেও বাংলাদেশ কৃষির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক কৃষির সাথে তুলনা করলে অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। যেমন বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ আর আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি হলেও ধান উৎপাদনে আমরা ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ হতে অনেক পিছিয়ে আছি। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে যাচ্ছেন। একসময় বাংলাদেশে বিশ্বের ৭৫ ভাগ পাট উৎপাদন হতো। কিন্তু ধানের চাহিদা ও কৃত্রিম আঁশের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার কারণে পাটের উৎপাদন কৃষকরা কমিয়ে দিয়েছেন। তবুও পাট জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে বেশি অবদান রাখছে। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

বাংলাদেশের বাজারে শুধু যে বাংলাদেশের পণ্যই পাওয়া যায় তা নয়। প্রতিবেশী দেশের পণ্যও বাজারে প্রবেশ করেছে। এতে বাংলাদেশের সাথে অন্য দেশের একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের কৃষির অবস্থা এ অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চিত্র : কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- কৃষিতে বিজ্ঞানীদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আধুনিক কৃষি ফলন এবং আমাদের জীবনধারার পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব।
- বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের কয়েকটি নির্বাচিত দেশের কৃষির অগ্রগতির সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের কৃষির সাথে কয়েকটি নির্বাচিত দেশের কৃষির তুলনা করতে পারব।

পাঠ- ১ : কৃষিতে বিজ্ঞানীদের অবদান

কৃষিতে বিজ্ঞানীদের অবদান অনেক। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় কৃষির সাথে যুক্ত করে কৃষি কর্মকাণ্ডকে আধুনিকায়ন করেছেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা যেমন বিজ্ঞানী হতে পারেন তেমনি কৃষকরাও বিজ্ঞানী হতে পারেন। আদি কৃষির উৎপত্তি সাধারণ মানুষের হাতেই। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা জলবায়ু, পরিবেশ, মাটি, পানি, উৎপাদন পদ্ধতি এসব বিষয় বিবেচনায় এনে উচ্চতর গবেষণা করছেন। তাদের নিরলস গবেষণার ফলে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি।

বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাগুলো দৃষ্টিগোচরে আনা জরুরি। এ দেশের প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে-

১। পুষ্টির সমস্যা

২। সার ব্যবস্থাপনা সমস্যা

৩। বন্যা ও খরা সমস্যা

৪। লবণাক্ততা সমস্যা

উপর্যুক্ত সমস্যাবলি সমাধানে বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছেন। সারাদেশে পুষ্টি সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা দেশকে ত্রিশটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। কোন অঞ্চলের মাটি কিরূপ এসব বিষয় উদ্ভাবন কৃষিবিজ্ঞানীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এসব অঞ্চলের মাটির ধরন বিবেচনা করে ফসল ফলানোর জন্য কোন ফসলে কী মাত্রায় সার প্রয়োগ করা হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়। তেমনিভাবে সার ব্যবস্থাপনায় সুন্দর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পূর্ববর্তী ফসলে যে মাত্রায় সার দেওয়া হয়েছে, তা বিবেচনা করে পরবর্তী ফসলের জন্য সারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কেননা কোন কোন সার নিঃশেষ হয়ে যায় না।

বন্যা, খরা, লবণাক্ততা বাংলাদেশের প্রধান কৃষি সমস্যা। এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য বিজ্ঞানীরা বেশ অগ্রসর হয়েছেন। যেমন বন্যার শেষে ধান চাষের জন্য বিলম্ব জাত হিসেবে ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কিরণ ও দিশারি নামে দুটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। সম্প্রতি বন্যাকবলিত এলাকার জন্য ব্রি ধান-৫১ ও ব্রি ধান-৫২ নামে আরও দুটি জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। এই জাতের ধান দুটি পানির নিচে ১০-১৫ দিন টিকে থাকতে পারে। কৃষিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

বন্যা যেমন কৃষকদের একটি বড় সমস্যা, খরা ও লবণাক্ততা আরও বড় সমস্যা। এজন্য বিজ্ঞানীরা ব্রি-৫৬, খরা সহনশীল ব্রি-৫৭ নামের ধান উদ্ভাবন করেছেন। উপকূল অঞ্চলের লবণাক্ততার সমস্যা দূর করার জন্য ব্রি ধান-৪৫ ও ব্রি ধান-৪৭ উদ্ভাবন হয়েছে।

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কৃষকেরা নতুন বিষয় আবিষ্কার করে কৃষিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। যেমন ঝিনাইদহের হরিপদ কাপালি হরিধান নামে একটি ধান নির্বাচন করেছেন। কিছু কিছু উদ্ভিদের বিশেষ অঙ্গ বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এইরূপ বীজের একটি বাড়তি সুবিধা বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন। এই ধরনের প্রজননে মাতৃগাছের সকল গুণাগুণ হুবহু পাওয়া যায়। ফুলের পরাগায়ণের সময় জীবতাত্ত্বিক বীজে পিতৃগাছের গুণাগুণ যুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে কিন্তু অঙ্গজ প্রজননে সে আশঙ্কা থাকে না। কৃষকরা কলা, আম, লিচু, কমলা, গোলাপ ইত্যাদির উৎপাদনে অঙ্গজ প্রজনন ব্যবহার করে থাকেন। ফসলের বীজ ও নতুন নতুন জাত উন্নয়ন, বীজ সংরক্ষণ, রোগ বালাইয়ের কারণ শনাক্তকরণ, ফসলের পুষ্টিমান বাড়ানো- এ সকল কাজই কৃষি বিজ্ঞানীরা করে থাকেন। এমনকি ফসল সংগ্রহের পর বিপণন পর্যন্ত ফসলের নিরাপত্তা বিধান ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার যাবতীয় প্রযুক্তি কৃষি ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে সম্পন্ন করেন।

কৃষির সঙ্গে বিজ্ঞানের নানা শাখার কর্মকাণ্ড জড়িত। কৃষিতত্ত্ব ছাড়াও মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন ইত্যাদি শাখার বিজ্ঞানীরা তথ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে অবদান রাখছেন। পশুপাখি পালন ও এদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অপর একদল বিজ্ঞানী ক্রমাগত কাজ করছেন। মৎস্য লালন পালন, প্রজনন, উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রেও একদল বিজ্ঞানী অবদান রাখছেন। এই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশেও বিভিন্ন গবেষণা ইন্সটিটিউট রয়েছে। এসব ইন্সটিটিউট ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে একজন কৃষিবিজ্ঞানী ও তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করে পোস্টারে লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

পাঠ- ২ : বাংলাদেশের মানুষের জীবন, সংস্কৃতি এবং কৃষির আধুনিকায়ন

বাংলাদেশের মানুষের জীবন, সংস্কৃতি এবং কৃষি এক সুতোয় গাঁথা। প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিই ছিল এ দেশের মানুষের অন্যতম অবলম্বন। সময়ের ধারাবাহিকতায় সেই প্রাচীন কৃষিতে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি উৎপাদনে বয়ে আনছে ব্যাপক সাফল্য। অথচ কৃষিপ্রধান এই দেশে এক সময় অভাব-অনটন লেগেই ছিল। এ ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সংঘটিত দুর্ভিক্ষ সমগ্র বাংলাদেশকে গ্রাস করেছিল। জাপানি সেনাদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে বৃটিশ সরকার বাংলা ও আসামের খাদ্যগুদামের খাদ্যশস্য হয় পশ্চিমে স্থানান্তর করেছিল, নয় ধ্বংস করেছিল। দুর্বিষহ দুর্ভিক্ষে শুধু পূর্ব বাংলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়। মহাযুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়লেও ঐ সময় বৃটিশ সরকার একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয়। আসাম ও বাংলার জন্য ঢাকার শেরে বাংলা নগরে একটি কৃষি ইন্সটিটিউট, কুমিল্লায় একটি ভেটেরিনারি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খুলে ডিগ্রি পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা চালুর ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি কৃষি বিভাগ নামে একটি বিশেষায়িত দপ্তর চালু করা হয়। এতে তাৎক্ষণিকভাবে দুর্ভিক্ষাবস্থার উন্নতি না হলেও বাংলাদেশের কৃষির আধুনিকায়নের যাত্রা শুরু হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৬১ সালে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এদের নির্দেশনায় তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার দক্ষ মাঠ কর্মী তৈরি করতে কিছু কৃষি সম্প্রসারণ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও পশু চিকিৎসা ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (AETI & VTI) স্থাপন করা হয়। প্রায় প্রতিটি জেলায় সরকারি কৃষি ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম এবং কোথাও কোথাও ডেইরি ফার্ম চালু হয় প্রদর্শনী খামার হিসেবে। পাট, আখ, চা ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের বিষয়ে গবেষণার জন্য একক গবেষণা ইন্সটিটিউট যথাক্রমে ঢাকা, ঈশ্বরদি ও শ্রীমঙ্গলে স্থাপিত হয়। গাজীপুরে কৃষি গবেষণা ও ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়।

এই সকল আয়োজনের ফলে পূর্ব বাংলায় কৃষির আধুনিকায়ন শুরু হয় গত শতকের ষাটের দশকে। প্রধান কৃষি ফসল ধানের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সবচাইতে বেশি দেখা যায়। বিভিন্ন স্বাদগন্ধের কম ফলনশীল স্থানীয় ধানের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল ইরি-ব্রি ধানের চাষ শুরু করা হয়। এগুলো চাষের জন্য সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির চাহিদা কৃষিতে বাড়তে থাকে। ফলে উৎপাদন ব্যয় ক্রমাগত বাড়তে থাকে। দরিদ্র কৃষকেরা হয় ক্ষেতমজুরে পরিণত হন না হয় ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে পাড়ি জমান নতুন পেশার খোঁজে। এ সময় উন্নত জাতের মুরগি, হাঁস ও গরুর খামার কিছু মানুষের কর্মসংস্থান করে দেয়। পরিবহন ও বিপণনের সুবিধার জন্য দেশের শহরগুলো ঘিরে আধুনিক মুরগির খামার দিন দিন বেড়ে চলছে।

কৃষিতে বিভিন্ন ফসলের উচ্চতর ফলন, পশুজাত দ্রব্যাদি যেমন- ডিম, দুধ, মাংস ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি হয় ও গ্রামীণ জীবনে শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

মাটি বা জমি কৃষির মূল ক্ষেত্র। এই মাটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। মাটির গঠন, প্রকারভেদ, উর্বরতা, মাটিতে বসবাসকারী অনুজীব ও এদের উপকারিতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ফসল উদ্ভিদ, গবাদি পশুপাখি, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর পুষ্টি, বৃদ্ধি, প্রজনন, নিরাময় ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে এই বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো কৃষকরা গ্রহণ করেছেন। ফলে স্বাস্থ্যসম্মত সুষম খাদ্য উৎপাদনে কৃষির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা, যব এই সব শস্যের উৎপাদনশীলতা আগের তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে চারটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি পূর্ণাঙ্গ ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে। প্রায় সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান পড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষকগণ গবেষণা করে থাকেন। তাদের গবেষণায় প্রাপ্ত উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীরা কৃষকদেরকে অবহিত করেন। ফলে দেশের কৃষি উৎপাদনে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। 'হাইব্রিড রাইস' নামে এক ধরনের ধান রয়েছে। নিয়ম কানুন মেনে চাষ করলে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল ধানের চেয়েও এই ধান বেশি ফলন দেয়।

বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের ফুল, ফল, শাক-সবজি, মুরগি, গরু, মাছ ও বৃক্ষ বিদেশ থেকে এনে এদেশের কৃষিতে সংযোজন করেছেন। এগুলোর সাথে সংকরায়ণ করে দেশীয় পরিবেশ সহনীয় নতুন জাত উ ভাবন করছেন যেগুলো এ দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কৃষি উৎপাদনের এই অগ্রগতি গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনেছে। কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। উৎপাদন বৈচিত্র্য বাড়ছে, সেই সাথে প্রতিযোগিতাও বাড়ছে। একই সাথে বাড়ছে পুঁজির ব্যবহার। মাছ, মুরগি ও ডিম উৎপাদন প্রায় শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের চাহিদা গ্রামীণ জনজীবনে দ্রুতই বেড়ে চলেছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন আমাদের জীবনধারার কী পরিবর্তন এনেছে তা ব্যক্ত করবে।

পাঠ-৩ : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কৃষির অগ্রগতি

আজকাল বিশ্বের দেশগুলোকে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভাগ করা হয়। এই দেশগুলোকেই আবার শিল্পোন্নত ও কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত করা হয়।

শিল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতেও উন্নত। এ সকল দেশ তাদের কৃষিকে উন্নত করে শিল্পে পরিণত করেছে। অপরদিকে কৃষিনির্ভর দেশের সরকার বা কৃষক শুধু অর্থনৈতিক কারণে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি আত্মস্থ ও ব্যবহার করতে পারছে না। আসল কথা হচ্ছে আজ অনুন্নত দেশগুলো কৃষিতে অনুন্নত এবং উন্নত দেশগুলো কৃষিতেও উন্নত।

স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষির অগ্রগতি : স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রাকালে দেশে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি কৃষি কলেজ, একটি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও কয়েকটি কৃষি সম্প্রসারণ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ছিল। এখন চারটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। এর পাশাপাশি প্রায় সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও পশুপালন অনুষদ চালু আছে। বর্তমানে সকল কৃষি ফসলের জন্য বিশেষায়িত গবেষণাগার রয়েছে। প্রতি বছর শহর ও গ্রামাঞ্চলে কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কৃষিকে অধিকতর পরিবেশ বান্ধব করার জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা Integrated Part Management (IPM) সহ উত্তম কৃষি কার্যক্রমে কৃষকদের উৎসাহিত ও দক্ষ করে তোলার বিবিধ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। কৃত্রিম রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য সবুজ সার এবং কম্পোস্ট সার তৈরি ও ক্ষেতে প্রয়োগ, কেঁচো জাত সার বা ভার্মিকম্পোস্ট প্রয়োগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কৃষকদের হাতে পৌঁছানো হচ্ছে। গবাদি পশুর খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য উন্নত গো খাদ্য উৎপাদন, ঘাস প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পোল্ট্রি ও মৎস্য খাদ্য তৈরিতে এখন বিপুল অগ্রগতি হয়েছে। দেশে পোল্ট্রি একটি কৃষি শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বাজারে মাছের একটা বড় অংশ এখন আসছে চাষকৃত মাছ থেকে। প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ সরকারিভাবে উৎসাহিত করায় কৃষি বনায়ন ও সামাজিক বনায়নের দিকে কৃষকরা আকৃষ্ট হচ্ছেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়েছে। বায়ো টেকনোলজি বা জীবকৌশল বিজ্ঞানে অগ্রগতি বাংলাদেশের কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশি বিজ্ঞানী কর্তৃক পাটের জেনেটিক ম্যাপ আবিষ্কার একটি উলেখযোগ্য ঘটনা। অর্থাৎ বাংলাদেশে কৃষির আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে।

ভারতের কৃষি : ভারত একটি বৃহৎ ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দেশ। ভারতের কিছু মরু অঞ্চল ছাড়া সমগ্র পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলই কৃষিপ্রধান। কৃষি পরিবেশেও দেশটি বৈচিত্র্যময়। ফলে শস্য, ফুল, ফল, সবজি, মাংস, দুধ, ডিম এমন কোনো কৃষিজ পণ্য প্রায় নেই যা ভারতে উৎপন্ন হয় না কিংবা বাজারে পাওয়া যায় না। ভারতের কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শুধু ভারতের কৃষি ব্যবস্থার কাজে লাগছে না, বিশ্বও উপকৃত হচ্ছে। ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের অন্যতম আমদানিকারক দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ।

চীনের কৃষি : পরিকল্পিত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সুবিধাগুলো সমাজতান্ত্রিক চীনের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার দেশ হলেও চীনে খাদ্য

ঘাটতির কথা শোনা যায় না। প্রতি হেক্টরে সর্বোচ্চ পরিমাণ ধান, গম, ভুট্টা উৎপাদনের ক্ষমতা চীনা কৃষক ও বিজ্ঞানীদের কব্জায় রয়েছে। আমাদের দেশে সদ্য প্রযুক্ত হাইব্রিড ধান বীজের একটা বড় জোগানদার চীন। চীনা প্রযুক্তি শেখা ও আমাদের মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভিয়েতনামের কৃষি : ভিয়েতনামের অগ্রগতিতে তাদের কৃষক সমাজ ও কৃষির অবদান বিরাট। বিশেষ করে বিশ্বের অন্যতম প্রধান চাল রপ্তানিকারক দেশ আজ ভিয়েতনাম। কৃষি প্রযুক্তি বিকাশে গত কয়েক বছরে এদের সাফল্য বিস্ময়কর। ওদের কাছে আমাদের শেখার রয়েছে অনেক।

কৃষির উন্নয়নের বিষয়টি দেশ বা অঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে আজ আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক গুরুত্ব লাভ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে যে প্রতিষ্ঠান বিশ্বজুড়ে কাজ করে তার নাম "খাদ্য ও কৃষি সংগঠন" (Food and Agricultural Organization, FAO)। এ ছাড়াও রয়েছে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের (International Rice Research Institue, IRRI, Phillipines) মতো বিশেষ ফসলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ। আমাদের দেশের কৃষি উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

কাজ

১. শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসাবে বাংলাদেশের কৃষির অগ্রগতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ খাতায় লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

২. কৃষির আধুনিকায়ন মানুষের জীবনযাত্রায় কীভাবে প্রভাব ফেলছে তার একটি বর্ণনা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ-৪ : এশীয় ও বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষির তুলনা

বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও ভিয়েতনাম এই চারটি দেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। এই দেশগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক দিক থেকে যেমন কিছু সাদৃশ্য আছে তেমনি কিছু বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। এই চারটি দেশের প্রধান কৃষি উৎপাদন হচ্ছে ধান এবং এর জনগণ প্রধানত ভাত খেতে অভ্যস্ত। এদের মধ্যে চীন, ভারত ও বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল দেশ। অবশ্য ভিয়েতনাম ততটা নয়।

বাংলাদেশ ও চীন

বাংলাদেশের তুলনায় চীন কৃষিতে অনেক উন্নত। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষিজাত উৎপাদনে চীন বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে আছে। চীন ধানের বংশগতির পরিবর্তন এমনভাবে ঘটাতে সক্ষম হয়েছে

যে তাদের অধিকাংশ ধানের জাত আর মৌসুম নির্ভরশীল নেই। এই জাতগুলো পূর্বের প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে হেক্টর প্রতি সাতগুণ পর্যন্ত ফলন দিচ্ছে। চীনের ধান গবেষকগণ দাবি করছেন আগামী প্রজন্মের ধান জাতগুলো এখনকার চাইতে দ্বিগুণ উৎপাদন দেবে। এই সুপার হাইব্রিড ধানের একটি বড় ধরনের অসুবিধা তো ইতোমধ্যে চিন্তার কারণ হয়েছে, তা হলো এই সকল অত্যাধুনিক ধানের বীজ সংরক্ষণ করা যায় না। এক প্রজন্মেই বীজের গুণাগুণ শেষ হয়ে যায়। চীনের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে এই সব ফসল হয়ত সহায়ক। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। কারণ ঐতিহ্যগতভাবে ধানবীজের জন্য বাংলাদেশের চাষিদের বীজ ব্যবসায়ীদের মুখাপেক্ষী না হলেও চলে। কেননা দেশের মোট ব্যবহৃত ধানবীজের অন্তত ৮৫% চাষিরা নিজেরাই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) এ পর্যন্ত যতগুলো উচ্চ ফলনশীল ধান জাত High Yielding Variety (HYV) উদ্ভাবন করেছে সেগুলোর বীজ ধানক্ষেতেই উৎপাদন করা যায়। চাষিরা পরবর্তী ফসলের জন্য বীজ সেখান থেকে সংরক্ষণ করতে পারেন। অর্থাৎ ধানবীজের জন্য বাংলাদেশের চাষিদের এক ধরনের সার্বভৌমত্ব রয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট সুপার হাইব্রিড ধান উৎপাদনের জন্য জোর গবেষণা চালাচ্ছে। শীঘ্রই হয়ত বাংলাদেশের চাষিরা এই অতি উচ্চ ফলনশীল দেশি ধান বীজ পাবে। তবে এই ধান উৎপাদনের অভিজ্ঞতা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশি চাষিরা রপ্ত করেছেন। কারণ কয়েকটি বীজ ব্যবসায়ী কোম্পানি এ ধরনের ধানের বীজ বাংলাদেশে চালু করতে আগ্রহী ছিল। এই প্রেক্ষিতে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত আকারে এ জাতীয় ধান উৎপাদনের অনুমতি দিয়েছিল এই শর্তে যে, কোম্পানিগুলো দেশেই এই ধানবীজ উৎপাদন করবে।

পাঠ- ৫ : বাংলাদেশ ও ভারত

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। এ দেশের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। কৃষির ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ দুই দেশেরই ঐতিহ্যের অঙ্গ। দুটি দেশই জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির দ্বারা সমস্যাগ্রস্ত। এই বিপুল দ্রুত বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা নিবারণের গুরুভার দেশ দুটির কৃষক সমাজের ওপর ন্যস্ত। ভারতের কৃষি বাংলাদেশের তুলনায় অনেক অগ্রসর। ধানসহ অন্যান্য শস্য, ডাল, ফুল ফল, শাক সবজি, ভোজ্য তেলবীজ, তুলা, আখ পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য সহ প্রায় সকল কৃষিপণ্য উৎপাদনে ভারত বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে। ভারতে রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডেইরি সমবায় প্রতিষ্ঠান-যা বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ। একই ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশীদার হওয়ার পরও গত ষাট-সত্তর বছরে এই ব্যতিক্রমী পরিবর্তনের ধারা চলেছে। এর প্রধান দুটি কারণের একটি হলো ভারতের কৃষক বাংলাদেশের কৃষকদের চেয়ে অনেক সংগঠিত; কারণ হলো কৃষিবিজ্ঞান ও

প্রকৌশলে ভারতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা শুধু ভারতের কৃষিকেই নয় বিশ্বের কৃষিকেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অবশ্য ভারতে কাজের ক্ষেত্রও বিশাল। বাংলাদেশের প্রায় আটাশগুণ বড় এই দেশটিতে কৃষি পরিবেশের বৈচিত্র্য একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ অপরদিকে ততোটাই সম্ভবনাময়। মরু অঞ্চল থেকে শুরু করে বরফাবৃত অঞ্চল, নিচু জলাভূমি থেকে শুরু করে পার্বত্য অসমতল ভূমি, অনুর্বর খরাপ্রবণ এলাকা থেকে নদীবিধৌত উর্বর অঞ্চলও রয়েছে। দেশের এক অঞ্চলে যখন তুষারস্নাত শীতকাল অন্য অঞ্চলে তখন গ্রীষ্ম বা বসন্তকাল। ফলে ভারতের সর্বত্র প্রায় সব ধরনের ফসল সারা বছরই উৎপাদিত হচ্ছে।

এত কিছুর পরও উভয় দেশের প্রায় সকল ফসলের জমির ইউনিট প্রতি গড় উৎপাদন কাছাকাছি। আবার ভারতের কিছু কিছু রাজ্য রয়েছে যেমন- পাঞ্জাব, হরিয়ানা বা কেরালা যেখানে ইউনিট প্রতি উৎপাদন অনেক বেশি।

পাট, চামড়া, ইলিশ ইত্যাদি কিছু পণ্য ছাড়া প্রায় সব কৃষিপণ্য ভারত থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়।

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম

বাংলাদেশের ও ভিয়েতনামের কৃষিতে বেশি মিল ধান উৎপাদন। তবে এক্ষেত্রে দৃশ্যত ভিয়েতনামের কৃষকদের অগ্রগতি বাংলাদেশের চেয়ে দ্রুত হয়েছে। পঁচিশ বৎসর আগে যেখানে ভিয়েতনামের কৃষি উৎপাদন অনগ্রসর ও দুর্বল ছিল, তারা প্রায় সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেছে। এই গতি পাওয়ার প্রধানতম কারণ হলো ভিয়েতনামের কৃষক সমাজ অত্যন্ত সংগঠিত। ভিয়েতনামের কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও সৃজনশীল। সেখানকার সকল কৃষক কোনো না কোনো সমবায় সংগঠনের সাথে যুক্ত। কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো এতো শক্তিশালী যে এরা স্থানীয় সরকারের বাৎসরিক ব্যয়ের অন্তত ৫০% যোগান দিয়ে থাকে। স্থানীয় কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তারা আর্থিক সহায়তা দেয়। এই সকল সংগঠন কৃষিনীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কৃষিতে ভিয়েতনাম থেকে বেশ কিছু মাঠ প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের কৃষির অগ্রগতির সাথে এশীয় অন্য একটি দেশের কৃষির অগ্রগতির তুলনামূলক আলোচনা পোস্টার পেপারে চার্ট আকারে লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

পাঠ- ৬ : ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা

ফসলের ক্ষেত্রে দিনের দৈর্ঘ্য সচেতনতা মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার প্রধান কারণ। এই দিবাদৈর্ঘ্য সংবেদনশীলতা দূর করতে বা কমিয়ে দিতে পারলে অর্থাৎ একটি মৌসুম নির্ভর ফসলকে মৌসুম নির্ভরতামুক্ত করতে পারলে ফসলটি যে কোনো মৌসুমে উৎপাদন করা যায়।

উপযোগিতা :

১। বাজারে অসময়ের ফল ও সবজির চাহিদা খুবই বেশি। এসব অসময়ের ফসল উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। কৃষক ও খুচরা বিক্রেতা উভয়ে বাড়তি পয়সা উপার্জন করতে পারে।

২। বিশেষ করে আগাম ফসল বাজারজাত করতে পারলে বেশি দাম পাওয়া যায়।

৩। ঋতুচক্র সংশিষ্ট কর্মহীনতা দূর করে কৃষককে মোটামুটি সারা বছর কর্মব্যস্ত রাখতে পারে।

৪। একই কারণে গ্রামীণ কর্মশক্তিকে সারা বছর কাজের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

৫। মঙ্গা বা এই ধরনের সাময়িক দুর্ভিক্ষাবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

৬। বাজারে কৃষিপণ্য বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে পারে।

৭। পুষ্টি সমস্যার সমাধান সহজতর করতে পারে।

৮। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে এনে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হতে পারে।

৯। বিদেশি ক্রেতাদের সারা বছর কৃষিপণ্যের লভ্যতার নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। ফলে কৃষিপণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো যায়।

১০। কৃষি গবেষণাকে মৌসুম নির্ভরতামুক্ত করা যায়।

ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার বিভিন্ন কৌশল

১। **ফসল উৎপাদনের কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি :** ফসলের জীবতাত্ত্বিক গুণাগুণ পরিবর্তন না করেই এই কৌশলে যে কোনো ফসল উৎপাদন করা যায়। উন্মুক্ত মাঠে বা উদ্যানে না করে গ্রিন হাউজে কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ বদ্ধ ঘরে কৃত্রিম উপায়ে পর্যাপ্ত আলো, উত্তাপ, বায়ুর

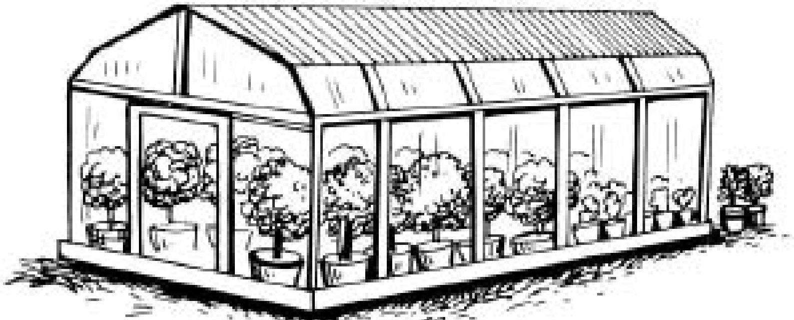

চিত্র : গ্রিন হাউজ

আর্দ্রতাসহ পরিবেশগত যাবতীয় উপাদান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি প্রত্যেক উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় সুষম পুষ্টি সরবরাহ করার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়। এই কৌশল বাস্তবায়নের প্রথম শর্ত হলো ফসলের পরিবেশ ও পুষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা। দ্বিতীয় শর্ত হলো প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও পুষ্টি সরবরাহের যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। এই পদ্ধতিতে যে কোনো ফসল উৎপাদন সম্ভব হলেও উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি। বিশেষ বিশেষ ফসল ছাড়া এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না। এই কৌশলে কোনো ফসল বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হওয়ায় এই পদ্ধতিতে ফসল হয় সম্পূর্ণ রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত।

আমাদের দেশে পরীক্ষামূলকভাবে এই পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম (মিষ্টি মরিচ), স্ট্রবেরি ও টমেটো উৎপাদন করা হয়েছে। বর্তমানে এই ফসলগুলোর বাজারমূল্য অনেক বেশি।

২। **ফসলের জেনেটিক বা বংশগতির পরিবর্তন :** ফসলের মৌসুম নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার এবং তুলনামূলক স্বল্প খরচের পদ্ধতি হলো ফসলের বংশগতিতে পরিবর্তন আনা। ফসলের জিনগত বিন্যাস বদলানো, ফসলের দিবাদৈর্ঘ্য সংবেদনশীলতার জন্য দায়ী জিন ছাঁটাই করা অথবা এমন পরিবর্তন আনা যাতে তা প্রশমিত থাকে। সংকরায়ণ ও ক্রমাগত নির্বাচনের মাধ্যম ছাড়াও অন্য বেশ কিছু আধুনিক উপায়ে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এই ধরনের ফসলকে জিএম ফসল বা

জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপ বলা হয়। এই বিশেষ কৌশলসমূহকে সাধারণভাবে বলা হয় জীব-কৌশল বা বায়োটেকনোলজি।

৩। অভিজ্ঞ কৃষকের পর্যবেক্ষণ, চয়ন ও নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও মৌসুম নির্ভরতা এড়াতে সক্ষম ফসল উদ্ভাবন করা যেতে পারে। এগুলো মাঠ পর্যায়ে টিকে গেলে নতুন জাত (ভ্যারাইটি/কালটিভার) হিসাবে স্বীকৃতিও পেতে পারে। কৃষক পর্যায়ের আবিষ্কৃত এই সব আগাম জাত, নাবি জাত মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে জনপ্রিয় কোনো কৃষিপণ্য বাজারে দীর্ঘসময় ধরে পাওয়া যায়। এই সকল কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় খুব বেশি না হওয়ায় কৃষকের মুনাফা বৃদ্ধিতে বেশ অবদান রাখতে পারে। ফসলের জাত উদ্ভাবনে মানবসৃষ্ট এটাই সবচেয়ে সনাতন পদ্ধতি।

কাজ : বাংলাদেশে গ্রিন হাউজে ফসল ফলানো কতটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. বন্যা, খরা .... বাংলাদেশের প্রধান কৃষি সমস্যা।

২. শিল্পোন্নত দেশগুলো .... উন্নত।

৩. ফসলের ক্ষেত্রে দিনের দৈর্ঘ্য সচেতনতা .... নির্ভরশীলতার প্রধান কারণ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেশের মোট ব্যবহৃত ধান বীজের শতকরা কত ভাগ চাষিরা নিজেরাই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করেন?

ক. ৬৫% খ. ৭৫%

গ. ৮৫% ঘ. ৯৫%

২. ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা গেলে-

i. বেকারত্ব দূর হবে

ii. পণ্যের দাম পাওয়া যাবে

iii. বিভিন্ন রকমের ফসল পাওয়া যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii | খ. i ও iii

গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রওশন আরা তাহার বসত বাড়ির বাগানে কয়েকটি ফল গাছের কলম চারা ও শাক সবজির বীজ বপন করেন এবং ভালো ফলন পান। কিন্তু পরবর্তী বৎসর নিজের উৎপাদিত শাক সবজির বীজ থেকে সবজি চাষ করে ভালো ফলন পেলেন না।

৩. রওশন আরার লাগানো ফল গাছগুলো কী ধরনের গুণসম্পন্ন হবে?

ক. মাতৃগাছের মতো | খ. পিতৃগাছের মতো

গ. মাতৃগাছ থেকে ভালো | ঘ. মাতৃ ও পিতৃগাছের মতো

৪. রওশন আরার পরবর্তী বছর সবজি চাষ করে ভালো ফলন না পাওয়ার কারণ?

ক. নিজের বাগান থেকে বীজ সংগ্রহ | খ. পরের বছর একই জমিতে সবজি চাষ

গ. মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকা | ঘ. মাতৃ ও পিতৃগাছের গুণাগুণ একত্রে হওয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

১ কৃষিনির্ভর এনায়েতপুর গ্রামের চাষিরা মৌসুমভিত্তিক ফসল চাষ করেন। তাদের উঁচু জমিগুলো অনেক সময়ই খালি পড়ে থাকে। ফলে চাষিরা ঐ সময়ে বেকার বসে থাকেন। জমিতে ফসল না থাকা ও বেকারত্বের কারণে দিশেহারা কৃষকরা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ চাইলে কৃষি কর্মকর্তা চাষিদের মৌসুম নির্ভরতা মুক্ত বিভিন্ন ফসলের জাত চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করেন। ধানসহ বিভিন্ন শাক-সবজির মৌসুম নির্ভরতামুক্ত ফসল চাষ করে এনায়েতপুরের চাষিরা বর্তমানে স্বাবলম্বী।

ক. জি এম ফসল কী?

খ. সুপার হাইব্রিড ধানের চাষ চাষিদের বীজের সাবভৌমত্ব নষ্ট করে ব্যাখ্যা কর।

গ. ফসল চাষে সফলতা পেতে এনায়েতপুরের চাষিরা যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে এনায়েতপুরের চাষিরা কীভাবে স্বাবলম্বী হয়েছিল- বিশ্লেষণ কর।

২. কৃষক রফিক টেলিভিশনে ভিয়েতনামের কৃষির উপর একটি প্রতিবেদন দেখছিলেন। প্রতিবেদনে ভিয়েতনামের কৃষিতে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি, চাষাবাদের ধরন ও চাষিদের কার্যক্রমের চিত্র দেখানো হয়। এক পর্যায়ে উপস্থাপক বললেন বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলো আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারার কারণে পিছিয়ে আছে। রফিক টেলিভিশনের অনুষ্ঠান থেকে ভিয়েতনামের চাষিদের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করে তার এলাকায় চাষিদের সংগঠিত করেন।

ক. কৃষি কী?

খ. আদি কৃষি উৎপত্তি সাধারণত মানুষের হাতেই- ব্যাখ্যা কর।

গ. রফিক কীভাবে তার এলাকার কৃষকদের সংগঠিত করেন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রে উপস্থাপকের মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কী?

২. কৃষিতে কৃত্রিম রাসায়নিক সারের নির্ভরশীলতা কীভাবে কমানো যায়?

৩. বাংলাদেশের কোন কোন কৃষিপণ্য ভারতে রপ্তানি হয়?

৪. গ্রিন হাউজ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার উপযোগিতা বর্ণনা কর।

২. ভারত ও বাংলাদেশের কৃষির তুলনামূলক বিবরণ দাও।

৩. কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে ফসল উৎপাদন কৌশল বর্ণনা কর।